Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 276 – 286
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অসমের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যা

বিপুল রায়
SACT, বাংলা বিভাগ
মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার
ইমেইল : bipulroy674@gmail.com

Keyword
দেশভাগ, দাঙ্গা, উদবাস্তু সমস্যা, ছিন্নমূল, শরনার্থী, গণভোট, বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সম্প্রীতি।

Abstract
দেশভাগ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক চরম বিপর্যয়ের ঘটনা। এই বিভাজনের মর্মান্তিক পরিণতিতে অখন্ড ভারতভূমি খন্ডিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে খন্ডিত হয় ভারতের ভূগোল, সমাজ, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক বন্ধন। সর্বোপরি মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে তৈরি হল এক গভীর সংকট। ইতিহাসে এই ঘটনা মানবজীবনের ট্রাজিক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ভারতবর্ষের এই বিভাজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ পাঞ্জাব, বাংলা ও অসমের ওপর। এই তিনটি অঞ্চলে দেশভাগের কিছু মৌল পার্থক্য আছে। তবে, বিভাজনের কবলে পড়া এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে দেশভাগ এবং উদবাস্তু সমস্যার যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে প্রত্যকটি অঞ্চলের কিছু স্বতন্ত্রতা রয়েছে। সেদিক থেকে অসমের দেশভাগের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা লক্ষ করা যায়। কারণ, জনমত হোক বা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ হোক কিংবা অন্য কোনও সমস্যাই হোক দেশ বিভাজনের জন্য অন্য আর কোথাও গণভোটের পথ অবলম্বন করা হয়নি। গণভোটের মাধ্যমে অসমের বিভাজনের ফলে যে ছিন্নমূল উদবাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বাঙালি জীবনকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্বদেশের ভিটেমাটি, জমি, অর্থসম্পদ, ঘরবাড়ি, চেনাপরিবেশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে হারিয়ে অসংখ্য মানুষ সেদিন উদবাস্তু হয়েছিল। সেই সময় কত যে বাঙালি মানুষ উদবাস্তু হয়ে ভারতে এসেছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া দুষ্কর। তবে জনগননা ও সরকারি বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় এখন পর্যন্ত তিন কোটির ওপর বাঙালি মানুষ উদবাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই উদবাস্তু মানুষেরা কীভাবে নানা প্রতিকূল পরিবেশে, আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে শত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যান তা এককথায় অনভিপ্রেত। এই অঞ্চলের কথা সাহিত্যিকদের লেখায় সেই চিত্র বাস্তবভাবে ফুটে ওঠে।

Discussion

দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যা পৃথিবীর নানা দেশের মতো ভারতবর্ষেরও একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ভারতবর্ষে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে পচাত্তর বছর পূর্বে। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে। ভারতবর্ষের মানুষ বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং হাজার হাজার শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছিল তা দেশভাগের মধ্য দিয়ে সম্ভব হল। ভারতবর্ষ দ্বি-খন্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ। আর এরই সঙ্গে দেখা দিল দেশভাগজনিত উদবাস্তু সমস্যা। কতিপয় সাম্রাজ্যলোভী, স্বার্থান্ধ নেতার ষড়যন্ত্রে সেদিন ভারতবর্ষের মাটিতে দেশভাগ নামক এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ভারতবর্ষের দেশভাগের ইতিহাস বলতে আমরা বেশিরভাগ মানুষ পাঞ্জাব আর বঙ্গদেশের বিভাজনের কথা জানি। পাশাপাশি অসমেরও যে বিভাজন ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে তা আমাদের অনেকেরই অজানা। তবে অসমের ক্ষেত্রে বিভাজনের ইতিহাস কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। কারণ, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক অসম অধিকার করার পর, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্বতন্ত্র অসম প্রদেশ গঠনের সময় বাংলার শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলাকে বাংলা থেকে বিচ্যুত করে অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল।[১] তাদের যুক্তি ছিল পিছিয়েপড়া অসমের রাজস্ব ঘাটতির চাপ তাতে কিছুটা কমবে এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটবে। সেই থেকেই অসমের একটি জেলা হিসেবে সিলেটের পরিচিতি। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিস শাসকের চক্রান্তে এবং কিছু স্বার্থান্ধ নেতার ষড়যন্ত্রে ভারত বিভাজন অবসম্ভাবি হয়ে পড়লে শাসকশ্রণি বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভাজন করার পাশাপাশি অসমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা সিলেটকেও বিভাজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে অসমের শ্রীহট্ট জেলার কোন কোন অংশ ভারতে আর কোন কোন অংশ পাকিস্তানে থাকবে তা নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণির মানুষের মধ্যে এক তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো এই উত্তেজনাকে হাতিয়ার করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। অবশেষে এই ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য শ্রীহট্ট জেলায় রেফারেন্ডাম বা গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন অসম তথা সিলেট প্রসঙ্গে ঘোষণা করলেন-

> "Through Assam is predominantly non a Muslim province, the district of sylhet which is contiguous to Bengal is predominantly Muslim.There has been a demand that in the event of the partition of Bengal, sylhet should be amalgamated with the Muslim part of Bengal.Accordingly, if it is decided that bengal should be partitioned,a referendum will be held in sylhet under the aegis of the Governor-General and in consultation with the Assam provincial Government to decide whether the district of sylhet should continue to form part of Assam province or should be amalgamated with the new province East Bengal if that province agrees.If the referendum results in favour of amalgamation with East Bengal, a Boundary Commission With terms similar to those for the Punjab and Bengal will be set-up to demarcate areas of Sylhet district and contiguous Muslim majority areas of adjoining districts which will then be transferred to East Bengal. The rest of Assam will, in any case, continue to [remain] in India."[২]

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট হলে দেখা যায়, শ্রীহট্টের পূর্ব-পাকিস্তান ভুক্তির পক্ষে ২৩৯৬১৯ টি বৈধ ভোটের মধ্যে ১৮৪০৪১ টি ভোট ভারতভুক্তির সমর্থনে পড়েছিল। আর ৫২৭৮০ টি ভোট পাকিস্তানের সমর্থনে পড়েছিল। ব্যবধান হয়েছিল ৫৫৫৭৮টি ভোটের।এই ভোটের প্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে স্যার সিরিল রাডক্লিফ শ্রীহট্টের বিভাজন ঘটায়। শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিনটি থানা - রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, বদরপুর ও করিমগঞ্জ থানার কিছু অংশ ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকল। আর প্রায় পাঁচটি পরগনা সদরসিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, করিমগঞ্জের কিছু অংশ পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) দিকে চলে গেল। তৎকালীন মোট ৭০৯ স্কোয়ার মাইল অঞ্চল অসমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।[৩] হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে জেলাভিত্তিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভারতের আর কোনও প্রদেশে কোনও

জেলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এরকম গণভোটের কোনও নজির নেই। ভারতবর্ষে অসমের এই বিভাজনের ইতিহাস তাই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়েই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়।

দেশভাগের ফলে সমস্ত বাঙালি জাতির জীবনে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এই একটি মাত্র ঘটনা হাজার হাজার বছরের বাঙালি জাতিসত্তাকে টুকরো টুকরো করে দিল। সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গেল আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরম্পরা, আর্থ-সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বীভৎস দাঙ্গা, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ, ধনসম্পতলুণ্ঠন, ধর্ষণ, নারীহরণ, অসংখ্য মানুষকে নিধন করা হল নির্বিচারে। ফলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে যার দেশে পালিয়ে যেতে লাগল। এভাবেই বাঙালি হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল উদবাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। স্বদেশের ভিটেমাটি, জমি, অর্থসম্পদ, ঘরবাড়ি, চেনাপরিবেশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে হারিয়ে অসংখ্য মানুষ সেদিন উদবাস্তু হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমেও সেই সময় অসংখ্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল উদবাস্তু হয়ে। সেই সময় কত যে বাঙালি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে অসমে এসেছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া দুষ্কর। তবে জনগননা ও সরকারি বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় এখন পর্যন্ত তিন কোটির ওপর বাঙালি মানুষ উদবাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই উদবাস্তু মানুষেরা কীভাবে নানা প্রতিকূল পরিবেশে, আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে শত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যান তা এক কথায় অনভিপ্রেত। তাদের এই অভিযানে কত যে প্রাণ অকালে ঝরে যায়, তার কোনও হিসেব থাকে না। কালের স্রোতে তা চাপা পরে যায়। দেশ ভাগের ফলে যে সকল বাঙালি হিন্দু উদবাস্তু হয়ে অসমে আশ্রয় নিয়েছিল এদের মধ্যে অনেকেই পুনর্বাসন লাভ করলেও অসংখ্য মানুষের ওপরই ঝুলছে ডি-ভোটারের মতো তীক্ষ্ণ তীর, ডিটেনশন ক্যাম্পের মতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন যাপন। আবার অসংখ্য মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে ভাসমান উদবাস্তু হয়ে। অসমের এই সমস্ত ছিন্নমূল উদবাস্তু মানুষগুলোর দুঃখ-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, হতাশা-ক্ষোভ, তাদের বেঁচে থাকার মরিয়া অভিযান, সাফল্য বা ব্যর্থতার কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে অসমের বাংলা উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের নানা শাখায়। তবে বিশেষত অসমের বাংলা উপন্যাসে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যার কথা।

দেশভাগজনিত উদবাস্তু সমস্যা : অসমের প্রেক্ষিতে :

দেশভাগ উত্তর-পূর্ব ভারতের উদবাস্তু বাঙালি জীবনে এক গভীর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অসমের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও চরম আকার নিয়েছে। দেশবিভাজনের পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত ছিন্নমূল উদবাস্তু বাঙালিরা কাতারে কাতারে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। এরকম অবস্থা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবেও লক্ষ করা গেছে দেশভাগের সময়। সেখানে পাঞ্জাবি উদবাস্তুদের আগমন অবশ্য এককালীন হয়েছিল। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদবাস্তুদের আগমন ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। আজও কোনো কোনো সময় এখানে উদবাস্তু আগমনের খবর শোনা যায়। বিরামহীন এই উদবাস্তু আগমের ফলে অসমের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে একপ্রকার সংশয় তৈরি হয়। তাদের গতানুগতিক জীবনে ছন্দপতন ঘটে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। তারা নিজেদের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। কূট-কৌশলি রাজনীতির ব্যাপারিরা এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে ফায়দা আদায়ের চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের অসমিয়াদের মনে বাঙালি বিদ্বেষি মনোভাব ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। তবে এই মানসিকতার উৎস দেশভাগের বহু পূর্বে ভাষা ও জনপ্রব্রজনের প্রশ্নে অসমিয়াদের মনে জাগরিত হয়েছিল। দেশভাগ-উত্তরকালে অসমে আশ্রিত ছিন্নমূল উদবাস্তু বাঙালি যেন পুরোনো সমস্যাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলল। এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অসমে বাঙালি উচ্ছেদের জন্য একে একে 'বঙ্গালখেদা আন্দোলন', 'অসম আন্দোলনের' মতো নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল। এই বিভিন্ন আন্দোলনের পাকচক্রে অসমে উদবাস্তু বাঙালির থিতু হওয়ার যে আপ্রাণ চেষ্টা এবং থিতু হওয়া বাঙালির যে কোনও মুহূর্তে ছিন্নমূল উদবাস্তু হওয়ার আশঙ্কা এই উভয় সংকটে কাটে এখানকার বাঙালির যাপিত জীবন। অসমের বাংলা কথাসাহিত্যে ছিন্নমূল উদবাস্তু বাঙালির জীবন সংগ্রামের এই কাহিনি লিপিবদ্ধ

আছে। এখন আমরা অসমের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করবো। এই আলোচনাটিকে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপন্যাস এই দুই পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হবে-

বরাক উপত্যকার বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যা :

১. 'বিন্দু বিন্দু জল' - শেখর দাশ :

বরাক উপত্যকার একজন উল্লেখযোগ্য কথাকার হলেন শেখর দাশ। জন্মসূত্রে সিলেটের সন্তান হওয়ায় দেশভাগ, প্রব্রজন, উদবাস্তু সমস্যা তাঁকে নানা দিক থেকে বিদ্ধ করেছে। ফলে প্রখর সংবেদনশীলতা দিয়ে তিনি বিন্দু বিন্দু জল' (২০০৪ খ্রিঃ) উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এই উপন্যাসটি ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'মোহনা' (২০০১ খ্রিঃ), 'বনজারা' (২০১৩ খ্রিঃ), 'রাঙামাটি', 'দ্রাঘিমা', 'রেগিস্তান', 'কালাপানি', 'নীলকণ্ঠ'।[৪] দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর একমাত্র উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'বিন্দু বিন্দু জল'। এই উপন্যাসে লেখক বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ, যন্ত্রণা কতটা নিদারুণ হতে পারে তার বাস্তবসম্মত কাহিনি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির একেবারে প্রথম দিকেই একটি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী সুরবালা বাস্তুভিটেতে শেষ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় আর মনে মনে ভাবে–

> "আজই তো এ ভিটের শেষ সন্ধাবাতি। কত পুরাতন পুরুষানুক্রমের ভদ্রাসন। কত জননী এখানে জন্ম দিয়েছেন বংশের ক্রম, হালকা শিশিরের মত এসব ভাবনা সুরবালার ভেতর হিমানীপাতহালকা শিশিরের মত এসব ভাবনা সুরবালার ভেতর হিমানীহালকা শিশিরের মত এসব ভাবনা সুরবালার ভেতর হিমানীপাত ঘটায়। ...যতটুকু তেল ভরা হলো সারারাত জলে কাল ভোর অব্দি জ্বলবে তো? ...কাল ভোর অবদি অবশ্যই জ্বলবে পেতলের পিলসুজের উলম্ব শিখা। ...কাল এমন সময়ে আলো দেওয়ার কেউ থাকবে না এ বাড়িতে।"[৫]

সুরবালার এই ভাবনা আসলে দেশত্যাগী সকল নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে।

এই মূল্যবোধহীন অবক্ষয়ের কালেও অনেক সহৃদয় মুষলমান মানুষ ছিন্নমূল উদবাস্তু হিন্দু মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে নিরাপত্তার কথা বলে আশ্বস্ত করেছে। তাদেরকে থেকে যাওয়ার কথা বলেছে। অনেক হিন্দু মানুষ এই সম্প্রীতির বন্ধনে বা বিশ্বাসে আস্থাও রেখেছে। এই উপন্যাসের একটি চরিত্র বাচিত আলি সুরবালাদের থেকে যাওয়ার কথা বলে জানায়-

> "বাচিত আলি বলেছিল বৌঠান, বরুণ হারু পারুল মাই-র কথা ভাইব না আমি থাকতে ওগো গায়ের লুম কেউ ছুইবার পারবেনা আল্লাহর নামে কথা দিলাম একা মুসলমান জান দিব কথার খিলাপ করব না,ইনশাআল্লাহ।"[৬]

সাম্প্রদায়িক হানাহানি বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কথাকার আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে বাচিত আলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যদিও সমাজে তাদের উপস্থিতি খুবই নগণ্য।

নাতিদীর্ঘ এই উপন্যাসে দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বাঙালির জীবনে ঘটা সর্বনাশের কথা তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক। সাত পুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হওয়া মানুষের কথা আখ্যানকার শুনিয়েছেন সুরবালার মাধ্যমে। ভদ্রাসন ছেড়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মত সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায় সুরবালা। তিন সন্তান সহ জীবিত পালিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হয় না। শরণার্থী শিবিরে মারা যায় মেয়ে পারুল। শরণার্থী শিবিরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বাল্যকালেই ঘটে তার অকালমৃত্যু।

শুধু তাই নয় উদবাস্তু ক্যাম্পে নারী ও যুবতী মেয়েদের কত রকমের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। উপন্যাসে বসুমতী নামে এক নারীর উপর যেভাবে পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তার বর্ণনা শুনলে শিউরে উঠতে হয় –

> "চিৎ শোয়া বসুমতীকে চেপে ধরেছে হাত। ...শরীরের চাপে নীচের শরীরকে বিবস্ত্র করতে চায়। প্রাণপণে বাধা দেয় বসুমতী। ছাড় ছাড়, সব খুলে নেয় টেনেহিঁচড়ে। মেয়েলী শরীর বেআব্রু।

> কতবার যে এমন হল, এখন আবরণ বলতে উপরে এক পুরুষ শরীর। দুমড়ে মুছড়ে শেষ করতে চায় বসুমতীকে।"[৭]

দেশভাগের এই অবিঘাতে বসুমতীর মতো অসংখ্য নারী ধর্ষিত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছে, কিন্তু তারা পালিয়ে যাবে কোথায়? এই পলায়ন কেবলমাত্র এপার বাংলা ওপার বাংলা ঘটনাক্রমে সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র পৃথিবীর বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের বর্ণনা হয়তো এভাবের এক বিন্দুতে মিলে যায়। কিন্তু সময় থেমে থাকে না। দেশ ভাগের পর আখ্যানের সময় পেরিয়ে যায় বিশ বছর প্রায়। নলিনী সুরবালার ছেলে বরুণ প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের পিতা। বুম্বা ও তুলি নতুন প্রজন্মের বাঙালি যারা রবীন্দ্রনাথের থেকে কিপলিংকেই পছন্দ করেন বেশি। তাদের মূল্যবোধ এসে ঠেকেছে তলানিতে। তাই নতুন বাড়ির সবচেয়ে খারাপ ঘরে জায়গা হয় সুরবালা ও নলিনীর। নাতি নাতনী পুত্রবধূর নানা রকমের অপমান সহ্য করতে হয় বৃদ্ধ দম্পতিকে। এভাবেই দেশভাগ এবং দেশভাগ পরবর্তীকালের নানা অভিঘাত লক্ষ করা যায় উপন্যাসটিতে।

২. 'সুরমা গাঙর পানি' - রণবীর পুরকায়স্থ :

বর্তমানে উত্তর-পূর্বের অন্যতম কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলো গল্পগ্রন্থ রচনা ও গল্পসংকলন সম্পাদনা করেছেন। 'বোকা কাশীরামের কথা' (২০০১), 'আসমান জমীন কথা' (২০০১), 'শিকড়ের সন্ধানে' (২০১১), 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' (২০১১), 'হেড়ম্ব পুরের প্রীতি কথা' (২০১৬), 'স্থায়ী কথা' (২০১৬), 'আসামের বাংলা ছোটগল্প' (২০১৮)। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর অন্যতম সারা জাগানো উপন্যাস 'সুরমা গাঙর পানি' (২০১২ খ্রিঃ)। উপন্যাসের মূল কাহিনিটি দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বের কোনো শিরোনাম ঔপন্যাসিক দেননি। দ্বিতীয় পর্বের নাম দিয়েছেন 'উজান পর্ব'। প্রথম পর্বে আছে দেশভাগের ষড়যন্ত্র আর গণভোট নামক প্রহসনের ফলে ভেঙ্গে পড়া সামাজিক জীবন। 'উজান পর্বে' রয়েছে বাস্তুহীন, দেশহীন বাঙালির জীবন যন্ত্রণার চিত্র। পরিস্থিতির চাপে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে নতুন দেশে এসে স্থায়ী আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার এক অন্তহীন লড়াই। উপন্যাসের প্রথম পর্বে জুড়ে রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল। আর দ্বিতীয় পর্ব ভারতবর্ষের অসম রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কাছাড় জেলা বর্তমানে বরাক উপত্যকা। দেশভাগের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম হওয়ার পর বাঙালিদের বিশেষকরে হিন্দু বাঙালিদের ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ জন্মভূমির বাস্তুভিটা ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয় ভারতবর্ষে। উপন্যাসের আখ্যানের ফুটে উঠেছে সর্বনাশের শুরু থেকে এর ভয়ংকর পরিণামের চিত্র। দেশভাগে বিপর্যস্ত হয়েছে সব শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু যার কথা সাধারনত শোনা যায় না সেই সব ব্রাত্যজনদের কথাই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক মৎসজীবী পাটনি সম্প্রদায়ের সমজভুক্ত এক যুবক। তার নাম বৈতল। সিলেটি ভাষায় এই বৈতল শব্দের অর্থ অকর্মণ্য, আপদ। উপন্যাসে আমরা পাই সুরমা- কুশিয়ারা - বরাক বিস্তৃত জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন বৈতলের জীবন সংগ্রামের কাহিনি। যে জীবন সংগ্রামের মধ্যে মূলত প্রতিফলিত হয়েছে দেশভাগে নির্বাসিত লক্ষ লক্ষ বাঙালির জীবন সংগ্রামেরই কাহিনি।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের ঘটনা প্রবাহের অন্যতম প্রধান বিষয় দেশভাগের বলি মানুষের পুনর্বাসন সমস্যা। এই সমস্যার রূপ প্রকাশ পেয়েছে ক্যাম্প জীবনের টুকরো টুকরো ছবির মধ্যদিয়ে। ক্যাম্পগুলিতে উদবাস্তু মানুষকে নানাভাবে শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত করা হয়। স্থানীয় মানুষজনও এই ক্যাম্প নিবাসী মানুষকে অবজ্ঞা, অবহেলা করে। উপন্যাসের নায়ক ক্যাম্প নিবাসী বৈতল রিলিফ অফিসারের কাছে জানতে চায়-

> "আমরার কিতা অইব, কই যাইমু, না অউ ছাপটা ঘরো থাকিয়া মরমু। শহরর মাইনষে কয় আমরা বলে চুর।"[৮]

উদবাস্তু আত্মপরিচয়ের সংকট স্পষ্ট হয় বৈতলের উচ্চারণে-

> "গান্ধীয়ে জিন্নায় ইতা কিতা করলা আমরার ! ...আমরা কিতা কইন চাইন, হিনর বাঙ্গাল হকলে কয় বাপর দেশো যা, আইলাম। ইনর হিন্দুয়ে বাঙালে কয় রিফ্যুজি। রিফ্যুজি কিতা হিন্দু না মুসলমান না খেদাখাওয়া হকলর নতুন ধর্ম।"[৯]

'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে লেখক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সংঘাত, বিদ্বেষ এবং এর ফলেই যে দেশ খন্ডিত হয়েছে তা বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন যেমন বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি উপন্যাসে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনও চিত্রিত করেছেন। এই উপন্যাসে বৈতল ও লুলা দুই বিপরীত ধর্মের বালক। কিন্তু বিপরীত ধর্মের হলেও দুজনের মধ্যে অটুট বন্ধুত্বের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। দুজনে একসঙ্গে মন্দির, মসজিদ আখরা ঘুরে বেড়ায়। লুলা মুসলমান হয়েও মন্দিরের প্রসাদ খায়, আখড়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কচুশাকখায়। বৈতল খায় মুসলমান বাড়িতে। বৈতলের মা এই দুই বন্ধুকে একসঙ্গে পাশে বসিয়ে সিদল ভর্তা দিয়ে খাওয়ায়। বৈতলের মায়ের কাছেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই বৈতল ও লুলাকে তার দুই পুত্র মনে করে বলেন-

> "রাম জন্মাইতে রহিম আর লুলা জন্মাইতে বৈতল। ছাড়াছাড়ি অইছ না বেটা।"[১০]

কিন্তু দেশভাগের ফলে এই দুই বন্ধুর মধ্যে সু-সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়।

বৈতল তার গুরু সৃষ্টি ধরের কাছে যখন জানতে পারে দেশভাগের গূঢ় রহস্য, তখন গুরুর কাছে আবেদন-নিবেদন করে যাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না থাকে, এমন বটিকা তিনি তৈরি করে দেন-

> "তুমি তো অমৃত বড়ি বানাইতায় পারো। তে কেনে সবরে অলাখান একখান থাকার বড়ি খাওয়াই দেও না। সবরে তারার ধর্মাধর্ম ভুলাই দেও। কল তারা সব সিলেটি অউকা। তারা মানুষ অউকা।"[১১]

বস্তুত আজকের দিনে এই সম্প্রীতির বন্ধন খুবই প্রাসঙ্গিক।

এই উপন্যাসের শেষপ্রান্তে এসে দেখা যায় দেশভাগের অভিঘাতে ছিন্নমূল উদবাস্তু মানুষের থিতু হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা শেষ হয়ে যায় না। তাই একাধিকবার উদবাস্তু হয়েও বৈতল পরিজনদের নিয়ে আবার নতুন জায়গার সন্ধানে পাড়ি দেয়। বর্ষার সময় কলাগাছের ভেলা বানিয়ে তিনজন মানুষ ভেসে যেতে থাকে। বৈতলের ছোট মেয়ে মরনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে- "বাবা আমরার কুনু বাড়ি নাই নি।" উত্তরে বৈতল জানায় – "না, নাইগো মাই।"[১২] এবারের বৈতলের গন্তব্য – নির্দিষ্ট নেই। অনির্দেশের উদ্দেশ্যে বৈতলের ভেলা চলে দুলে দুলে নতুন বসতি গড়ার লক্ষ্যে।

৩. 'সুরমা নদীর চোখে জল ' - ইমাদ উদ্দিন বুলবুল :

বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের 'সুরমা নদীর চোখে জল'(২০১৩খ্রিঃ) উপন্যাসটি দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। দেশভাগের ফলশ্রুতিতে উদবাস্তু সংকট উপন্যাসে এভাবে চিত্রিত হয়েছে-

> "আমারে ভাসাইলায় গো আল্লা
> সুরমা নদী গাঙ্গে
> ভাসিয়া ভাসিয়া হাসন রাজায়
> তোমার চরণ মাঙ্গে ।
> মরণ কালেরে
> কে যাইবো তোর সঙ্গে।"[১৩]

এই গানটি দেশভাগ পরবর্তী সুরমা নদীর উভয় পারের মানুষের আশা,আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে যেন দেশভাগ একটি আঘাত হয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনে। এই দেশভাগ হওয়ার পরেও সুরমা নদীর উভয় পারের মানুষ অভিন্ন সংস্কৃতি পালন করছে। সিলেটের সঙ্গে যে বরাকের মানুষের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছেদ হওয়ার নয়, তাই লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় –

> "১৯৪৭ সালে তাদের গ্রামের পশ্চিমদিকে পূর্বপাকিস্তান নামে দেশের সৃষ্টি হয়েছে সুরমা নদী হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের সীমা।"[১৪]

এই সুরমা নদীরই নানা গল্প ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে উপন্যাসের নায়ক জামান এবং যখন বিডিও হয়েছেন তখনও স্বপ্নে এই নদীকেই দেখতে পান। সেই সঙ্গে এই নদীকেন্দ্রিক মানুষ গুলির দুঃখ দুর্দশার ছবি দেখে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে -

> "দেশে তো দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। না হয় আরোও একটু বেশি বেশি হবে। গরীবের দুর্দশা তো কেউ দুর করতে পারবে না। ... মুষ্টিমেয় কিছুলোক ধনী হয়েছে মাত্র।"[১৫]

স্পষ্ট ভাবে ঔপন্যাসিক বুঝিয়েছেন যে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সমাজে গরিবদের অবস্থা যেমন ছিল তা বর্তমান সময়েও তেমনি রয়েছে কোনো পরিবর্তন হয়নি, মুষ্টিমেয় কিছু লোক ধনী হয়েছে মাত্র।

দেশ ভাগের কোরালগ্রাস দুই দেশের মানুষের কাছ থেকে সুরমা নদীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ফলে দুই দেশের মানুষের ভারাক্রান্ত হৃদয় আর দুঃখ বিষাদের যাপন চিত্র এই উপন্যাসকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। সেই সঙ্গে এই সুরমা নদীকে কেন্দ্র করে বিশেষত বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দেশভাগ, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুরু করে অসমের বঙালখেদা আন্দোলন, দাঙ্গা এবং দেশভাগ পরবর্তী সময়ের মানসিক যন্ত্রণা ও বেদনার কথা উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে।

৪. 'যার নাম অভিষেক', 'বিদায় জন্মভূমি' ও 'সময়ের স্বরলিপি' - অতীন দাশ :

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা অতীন দাশের প্রথম উপন্যাস 'যার নাম অভিষেক' (২০১১ খ্রি) এবং দ্বিতীয় উপন্যাস হল 'বিদায় জন্মভূমি' (২০১২ খ্রি)। এই দুটি উপন্যাস লেখকের আত্মজীবনের প্রক্ষেপ লক্ষ করা যায়। অতীন দাশ অভিষেকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তার নিজের জীবনের দেশভাগের কাহিনি। উপন্যাসটির মূল বিষয় হলো দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে খণ্ডিত ভারতবর্ষের দুর্দশার করুন ছবি। একবার ১৯৪৭, দ্বিতীয়বার ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এই উপমহাদেশে মানুষের রক্তগঙ্গা বয়ে গেলেও সেই ভোগান্তির সমাপ্তি ঘটেনি। এই ভোগান্তির টুকরো টুকরো কাহিনি 'যার নাম অভিষেক'-এ বর্ণিত।

'যার নাম অভিষেক' যেখানে শেষ হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বিদায় জন্মভূমি' (২০১২ খ্রি) সেখান থেকে শুরু হয়েছে। অভিষেকের জীবনে নানা উত্থান পতন এই অংশে বর্ণিত। কাহিনিতে দেখা যায় অভিষেকের পিতা হর্ষমোহন একসময় পুরো আট গ্রামের মধ্যেই হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন মাতব্বর ছিলেন। দেশভাগের ফলে সেই প্রভাব প্রতিপত্তি, ঠিকাদারি সব হারিয়ে এখন প্রায় নিঃস্ব। তবুও হর্ষমোহনের নিজ দেশের মাটির প্রতি প্রাণের টান রয়েছে। তাই তার মধ্যে জেদি মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় –

> "যেখানে জন্মেছি সেখানেই মরবো। স্থানে মান, অস্থানে অপমান। রাষ্ট্র বিপ্লবে নিঃস্ব হলেও যতদিন কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছে না ততদিন মাটি আঁকরে পরে থাকব।"[১৬]

হর্ষমোহনের উত্তর প্রজন্ম অভিষেক যেন নিয়তির হাতে অসহায় পুতুল মাত্র। তাকে শেষপর্যন্ত সিলেটের ছাতক অঞ্চল ছাড়তে হয়। কিন্তু যে ছাতক অঞ্চল ছিল অভিষেকের প্রাণ, সেই অঞ্চলের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছ থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। দেশের ভূখণ্ড ছেড়ে ওপারে ইন্ডিয়ায় পা দিয়েই অভিষেক আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। সে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে। দেশের মাটিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে বলেন- 'বিদায় জন্মভূমি'।

আর তৃতীয় উপন্যাস 'সময়ের স্বরলিপি' তে বর্ণিত হয়েছে দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে অসমের বাঙালি কীভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ভোটের রাজনীতি, দেশবিভাগে জহরলাল নেহেরুর ভূমিকা, একাদশ ভাষা শহীদ, ডি. ভোটার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নানা আলোচনা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদবাস্তু সমস্যা :

১. 'দেশ' - দেবীপ্রসাদ সিংহ :

অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন বিশিষ্ট কথাকার হলেন দেবীপ্রসাদ সিংহ। তাঁর জন্ম তৎকালীন কাছাড় জেলায়। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক। গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত 'একা এবং কয়েকজন' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। তিনি রচনা করেছেন 'রূপ কথার প্রত্যাবর্তন'(১৯৯৭), 'সীমান্তের উপর থমকে থাকা পা'(২০১৬) গল্পসংকলন।

দেবীপ্রসাদ সিংহের প্রথম এবং সার্থক প্রয়াস হলো 'দেশ' (মুখাবয়ব পত্রিকায় প্রকাশ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে) উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটি প্রথাগত যান্ত্রিক রৈখিকতার নীয়মে রচিত হয়নি। ছক ভাঙ্গা এক নির্দিষ্ট আদলে উপন্যাসের

পাঠগুলি বিন্যস্ত হয়েছে। যেখানে উপন্যাসের মূল চরিত্র অনিমেষ ও পারমিতা রায়ের সন্ততিরা সময়ের পথ অনেকটা ভেঙ্গে নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলতে চায় কালের অগণিত ইতিহাসকে - যা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং চূড়ান্তভাবে সামাজিক। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটটি গড়ে উটেছে দেশভাগ ও উদবাস্তু জীবনের নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে। অসহায়তা ও অনিশ্চিয়তার একটি পুরনো দাবিকে সামনে রেখে তারা কাল নির্দিষ্ট ইতিহাসকে নিজের মতো গড়ে নেওয়ার খেলায় মাতে। উত্তর প্রজন্ম তৈরি করে তাদের পূর্বপুরুষের অসহায়তার এক একটি গল্প। কারণ কাহিনির মূল চরিত্র অনিমেষ ও পারমিতা কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে শ্রীহট্ট থেকে পালিয়ে এসেছিলেন অসমে সেই ইতিহাস অনন্ত, অর্জুন, দোয়েল ইত্যাদি কেউ জানেন না। অথচ সেটা তাদের পারিবারিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের কথোপকথন থেকে তা বোঝা যায় –

> "শ্রীযুক্ত বাবু অনিমেষ রায় শ্রীমতী পারমিতা রায়কে নিয়ে কিভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন, সেই ইতিহাস তুই কি জানিস দোয়েল? না মা ওখানে এসেই চুপ করে যেত। তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। তুই জানিস, ছোড়দা? জানি মানে? নিজের মা বাবা আর আমি জানবো না?
>
> তাহলে বলনা, আমার ভীষন জানতে ইচ্ছে করে, দেশের বাড়ির গল্প টুকরো টুকরো যা শুনেছি তা থেকে আমি কোনো কমপ্লিট পিকচার তৈরি করে উঠতে পারি না। অথচ সেটা তো আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ!...
>
> অর্জুন তুই সত্যি জানিস? বল না গল্পটা! গল্প? আয়াম টকিং ইতিহাস হিয়ার, বৌদি।"[১৭]

দেশভাগ কে আধুনিক প্রজন্ম কীভাবে দেখছে? দেশ ভাগের যন্ত্রণা থেকে কী অসমের আধুনিক প্রজন্মের বাঙালি দূরে সরে এসেছে এইসব প্রশ্নের উত্তর এই উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় অর্জুন ও বৌদির চরিত্রের কথায় –

> "রিফিউজি হয়ে আমাদের এক দিক দিয়ে খুব ভাল হয়েছে। আমাদের কোনো দেশ নেই, পিছু টান নেই, কুয়োর ব্যাঙ হওয়া থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি।... সব দেশেই আমার দেশ, এবং কোনো দেশই আমার দেশ নয়।"[১৮]

২. 'বেদুইন' - কুমার অজিত দত্ত :

কুমার অজিত দত্তের ঔপন্যাসিক অধ্যায় শুরু হয়েছে 'মৃত্যুহীন'(২০১৯ খ্রি:)উপন্যাসটি দিয়ে। এর পর তিনি লিখেছেন 'প্রথম আলোয়' (২০১৩খ্রি: মুখাবয়ব পত্রিকায় প্রকাশ) 'সেই সময়ের এসময়' (২০১৩খ্রি:), 'ভিটেমাটি' (২০১৭খ্রি:), 'বেদুইন' (২০১৭খ্রি:), 'মরন্যাচরের ইতিকথা' (২০১৯খ্রি:) প্রভৃতি। দেশভাগ-দেশত্যাগের পটভূমিতে তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'ভিটেমাটি' ও 'বেদুইন' এই উপন্যাস দুটির নিবেদন অংশে ঔপন্যাসিক বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন-

> "বাঙালি একদিকে যেমন সমাজ গঠন প্রক্রিয়াগুনে নিজের জায়গায় থিতু হয়ে বসেছে আটসাট হয়ে সে সুদূর অতীত কাল থেকে,অন্যদিকে আবার দেশান্তরিত হতে হয়েছে তাকে বার বার বিপুল ভাবে। এই দেশান্তরিত হয় কখনো উচচশিক্ষা ও জীবিকার সন্ধানে গিয়ে, কখনো দেশভাগ ইত্যাদি জনিত কুটিল রাজনৈতিক পেষনে, মৃত্যু ভয়ে জেরবার হয়ে। ...কিন্তু এই দেশান্তরিত হওয়ার নেপথ্যে থেকে যায় অশান্ত সময়কাল প্রকৃতি, পরিবেশ, কৃষ্টি, প্রেম, ভালোবাসা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্মর লড়াই, দাঙ্গা, নিপীড়ন, দ্রোহ, দ্বন্দ্ব, হতাশা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গতা আর দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাস-ফুটে উঠেছে ভিটেমাটি ও বেদুইন উপন্যাসে।"[১৯]

দেশভাগ ও ছিন্নমূলের যন্ত্রণা নিয়ে লেখা কুমার অজিত দত্তের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'বেদুইন' (২০১২ সালে মাসিক যুগশঙ্খ পত্রিকায় প্রকাশ) এই উপন্যাসের কাহিনি মূলে দেখা যায় নগেন্দ্র নারায়নের পূর্ব পুরষরা পূর্ব বাংলায় বসবাস করেছিল। কিন্তু পার্টিশনের পরে তাদের সেখানে থাকা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমন, হত্যা, দাঙ্গা ইত্যাদির জন্য তারা এক প্রকার বাধ্য হয়ে ভিটেমাটি ফেলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। উপন্যাসে সেই বর্ণনা পাওয়া যায় –

> "এই পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ গায়ে গঞ্জের হিন্দুদের স্বাধীনতা হরণ করে নেওয়া হয়েছে, মাঝে মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। হিন্দুদের হিন্দু পরিচয় নিয়ে থাকতে বেগ পেতে হচ্ছে। তাই যারা স্বধর্মে শ্রদ্ধাবান তারা ওপার বাংলা বা অসম বা ত্রিপুরায় বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে পাড়ি দিচ্ছে সেখানে। পাড়ি দিচ্ছে মানে কি, অনেকটা পালিয়ে যাচ্ছে তারা।...আজ প্রকৃতপক্ষে একাকী হল নগেন্দ্র। যদিও একান্নবর্তী পরিবার তাদের। আরোও দুই কাকা আছেন। এক কাকা তো এই একান্নবর্তী বসতবাড়ির মায়া ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছেন পশ্চিমবাংলায় হালি শহরে। শুধু এই কাকাই নয় এই পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু পরিবার চলে গেছেন এবং চলে যাচ্ছেন জমি বাড়ি ছেড়ে এখনও ওপার বাংলায় নয়তো অসমে বা ত্রিপুরায়।"[২০]

৩. 'লোহিতপারের উপকথা' - সমর দেব :

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথাকার সমর দেব লিখেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস 'পরিপ্রেক্ষিত' (১৯৮৬খি:), 'এক যুগ আত্ম প্রতারনা' (২০০৩খি:), 'একটি গল্পের সুলুক সন্ধান' (২০০৭খি:), 'লোহিতপারের উপকথা' (২০১০খ্রি), 'নীল অন্ধকার' (২০১২খ্রি:), 'লঙ্কাবরের উমেস মাঝি', 'মুখোমুখি', 'ভালোবাসা কারে কয়' প্রভৃতি। তবে এই লেখা গুলির মধ্যে 'লোহিতপারের উপকথা' অবশ্যই প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা।

'লোহিতপারের উপকথা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে প্রান্তীয় পান্ডুর ব্রহ্মপুত্র ঘেঁষা একটি বস্তি। কার্যত এই উপন্যাস বস্তিবাসী মানুষের জীবন আলেখ্য। বস্তির বেশির ভাগ মানুষই উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল। কেউ দেশভাগের বলি, কারো বসতবাড়ি ডুবে গেছে ব্রহ্মপুত্রের অতলে। কেউ নগরায়নের বলি হয়ে পূর্বতন ভিটে থেকে উচ্ছেদিত। কেউ বা পলাতক হয়ে আশ্রয় নিয়েছে বস্তির এক কোণে। এই বস্তি কারো বসতবাড়ি নয়। বলা ভালো আস্তানা। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই শেকড় হীন। এই বস্তিই তাদের শেষ সম্বল। জীবনের যাবতীয় অনিশ্চয়তা, সংকট ও যন্ত্রণা এখানকার মূল সুর কথকের বয়ানে তা ফুটে উঠেছে -

১. সুবলের বাবা পরানের আর্তস্বর – "কনে যামু! আমাগো যাওনের জাগা নাই!"[২১]

২. "ভুট আইলেই একদল কইব আমরা বিদেশি। আরাক দল আইয়া কইব; কেডা কইছে বিদেশি। তুমরা হইলা গিয়া শরণার্থী।"[২২]

৩. "লুটিশ দিচ্ছে পুলিশ থিক্যা। আয়েমডিটে যায়া ফরমান করতে অইব তুমি বাংলাদেশী না।"[২৩]

৪. "আমাগো জন্ম তো এই দ্যাশেই বরপেটায় আছিলাম, নগাঁওয়ে আছিলাম।"[২৪]

৪. 'সেই তো আমার আমি' - মুক্তি চৌধুরী :

মুক্তি চৌধুরীর 'সেই তো আমার আমি'(২০১৩খ্রি:) উপন্যাসে দেশভাগ, দেশত্যাগ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি সমস্যা মূর্ত হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় দেশ ভাগ ও দেশ ত্যাগের শিকার খেয়ালি নামে এক কিশোরী পরিবারচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষের অসমে চলে আসে। এখানে এসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গুয়াহাটিতে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়ে ওঠার নিঃসঙ্গ জীবন কাহিনি বিভিন্ন ঘটনার সন্নিবেশে রূপ পেয়েছে। আসলে এই উপন্যাসে লেখিকা খেয়ালির মধ্য দিয়ে অগণিত নাম নাজানা খেয়ালির শৈশব কৈশোরে নীরব হাহাকার আর আর্তনাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখিকা নিজেও যে তার স্বীকার সে কথা উপন্যাসের প্রচ্ছদ অংশে প্রমাণ মেলে –

> "খেয়ালির আবরণে লেখিকা নিজের ভারাক্রান্ত, শৈশব - কৈশোরের আবেগ - অনুভূতির এক বেদনা - বিধুর বাস্তব আলেখ্য রচনা করেছেন।"[২৫]

দেশভাগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষত অসমের বাঙালি জীবনে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে, কখনো তা শুকোবার নয়। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রম করেও এই অঞ্চলের বাঙালির চিত্তে ও মননে দেশভাগের দুঃখ ও যন্ত্রণা নিরন্তর বহমান। কাঁটাতারের ঘা শুকিয়ে যায়নি আজও, শুধু আদল পাল্টে কখনো সংখ্যালঘু-গুরুর জাতিগত বিদ্বেষ,

ভাষাগত বিদ্বেষ, কখনো ডি ভোটার, কখনো বা ডি-ক্যাম্পের মারপ্যাঁচে রক্তক্ষরণ অবিরত হয়ে চলেছে। জাতিগত, ভাষাগত কারণে শাসকশ্রেণি যেকোনো মুহূর্তে বাঙালিদের আবারো দেশহারা বাস্তুহারা করে দিতে উদ্যত। দেশভাগের ফলে অসমের বাঙালিদের কিছু সমস্যা শুধু মাত্র এই অঞ্চলের বাঙালিদেরই হয়ে থাকে, যারা দেশভাগে ছিন্নমূল হয়ে এখনো অস্তিত্বের লড়াই লড়ে যাচ্ছেন। এই অঞ্চলের কথা সাহিত্যিকের লেখায় ছিন্নমূল উদবাস্তু বাঙালি জীবনের সংকট, সংগ্রাম এবং বিপর্যয়ের ট্রাজিক চিত্রগুলি উপন্যাসের পাতায় জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে। এই অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত দেশভাগের উপন্যাস বা পার্টিশনের সাহিত্য হিসেবে এই উপন্যাসগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। সব মিলিয়ে বলা যায়, পূর্ব (বর্তমান বাংলা দেশ) ও পশ্চিম বঙ্গ এই দুই ভুবনের মাঝখানে অবস্থিত তৃতীয় ভুবনের (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের) উপর দেশভাগের অভিঘাতের কথা এই অঞ্চলের কথাকারেরা যে ভাবে তুলে ধরেছেন তা এক নতুন পথের সন্ধান দেবে।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, মহাদেব, 'উত্তর-পূর্ব ভারত সেদিন ও আজ' (প্রথম খন্ড), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৩৮
২. বর্মন, প্রসূন, 'দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ মে২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১৩০-১৩১
৩. মন্ডল, মননকুমার, 'পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩০২
৪. দাশ, শেখর, 'বিন্দু বিন্দু জল', স্রোত প্রকাশনা, স্রোত সংস্করণ ২০১৯, ত্রিপুরা, পৃ. ৯৪
৫. তদেব, পৃ. ১৩-১৪
৬. দাশ, শেখর, 'বিন্দু বিন্দু জল' অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৫৩
৭. দাশ, শেখর, 'বিন্দু বিন্দু জল', স্রোত প্রকাশনা, স্রোত সংস্করণ ২০১৯, ত্রিপুরা, পৃ. ৯২
৮. পুরকায়স্থ, রণবীর, 'সুরমা গাঙর পানি', একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২১০
৯. তদেব, পৃ. ২১০
১০. তদেব, পৃ. ১৩
১১. তদেব, পৃ. ১৫৮
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৪
১৩. বুলবুল, ইমাদ উদ্দিন, 'সুরমা নদীর চোখে জল', নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, শিলচর, পৃ. ১৯
১৪. তদেব, পৃ. ১৮
১৫. তদেব, পৃ. ১৫
১৬. দাশ, অতীন, 'বিদায় জন্ম ভূমি', সোপান পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ২৮
১৭. দেব, দেবব্রত (সম্পাদক), 'মুখাবয়ব', বিশেষ উপন্যাস সংখ্যা-১, ৩০বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, মাঘ- চৈত্র ১৪২০, পৃ. ৫৯
১৮. তদেব, পৃ. ৯১
১৯. দত্ত, কুমার অজিত, যুগলবন্দি, 'ভিটেমাটি' ও 'বেদুইন', বিকাশ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ৭
২০. তদেব, পৃ. ১১৩
২১. দেব, সমর, 'লোহিতপারের উপকথা', ভিকি পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ২০১০, গুয়াহাটি, পৃ. ৯
২২. তদেব, পৃ. ১১

২৩. তদেব, পৃ. ১৬
২৪. তদেব, পৃ. ১৭
২৫. চৌধুরী, মুক্তি, 'সেই তো আমার আমি', প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, কলকাতা, পৃ- প্রচ্ছেদ অংশ।